স্থবিরতা কাটার লক্ষণ নেই

● হাবিবুর রেজা

ঈদুল আজহাও চলে যাচ্ছে, সামনেই শীতঋতু; এবার কি তাহলে সরগরম হয়ে উঠবে রাজনীতির মাঠ? ঈদুল ফিতরের আগেও শোনা গিয়েছিল, ঈদের পর বিএনপি তার সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে নতুন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করবে। এ লক্ষ্যে তখন বিএনপিকে বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেও দেখা গেছে। এমনকি ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর প্রথমবারের মতো একটি হরতাল কর্মসূচিও পালন করেছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট গত ২২ সেপ্টেম্বর। যদিও শেষ পর্যন্ত হরতালটি রাজনীতিতে কোনো উত্তাপ যুক্ত করতে পারেনি এবং পরিণত হয়েছে একটি গতানুগতিক কর্মসূচিতে। পাশাপাশি দল ও জোটের বিভিন্ন সঙ্কট ও দ্বন্দ্বের কারণেও বেকায়দায় রয়েছে বিএনপি। বলা অত্যুক্তি হবে না, সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিকল্পনা নিলেও শেষ পর্যন্ত বিএনপি স্থবিরতার গণ্ডিতেই আটকে রয়েছে।

তাই বলে সরকারি দল আওয়ামী লীগ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে, তাও বলা যায় না। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী তথা বিচারপতিদের অভিশংসন আইন করার পর ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দেয়ায় আওয়ামী লীগও এখন আর জনগণের আস্থায় নেই। জনগণের মধ্যে একটি বড় সংশয় ও সন্দেহ কাজ করছে, আর তা হলো, জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আওয়ামী লীগের একটি গোপন সমঝোতা হয়েছে। মানুষজনের ধারণা, এই সমঝোতার কারণেই বিভিন্ন যুদ্ধাপরাধীর বিচার কার্যক্রমে যেমন কোনো অগ্রগতি ঘটছে না, ঠিক তেমনি জামায়াতে ইসলামীও তাদের যুদ্ধাপরাধী নেতাদের রক্ষাকল্পে কঠোর কোনো কর্মসূচিতে যাচ্ছে না; বিএনপিসহ ২০ দলীয় ঐক্যজোটের সর্বশেষ হরতালে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের অংশগ্রহণ সে কারণেই ছিল ন্যূনতম মাত্রায়।

দল ও জোটের বিভিন্ন সঙ্কট ও দ্বন্দ্বের কারণেও বেকায়দায় রয়েছে বিএনপি। বলা অত্যুক্তি হবে না, সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিকল্পনা নিলেও শেষ পর্যন্ত বিএনপি স্থবিরতার গণ্ডিতেই আটকে রয়েছে।

...

সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী তথা বিচারপতিদের অভিশংসন আইন করার পর ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দেয়ায় আওয়ামী লীগও এখন আর জনগণের আস্থায় নেই। জনগণের মধ্যে একটি বড় সংশয় ও সন্দেহ কাজ করছে, আর তা হলো, জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আওয়ামী লীগের একটি গোপন সমঝোতা হয়েছে

...

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জোটের বাইরে একটি বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েক মাস ধরেই প্রচেষ্টা চলছে... এই বিকল্প উদ্যোগ এখন পর্যন্ত তেমন কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। সব মিলিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে চলছে স্থবিরতা এবং তা দূর হওয়ার আশু কোনো লক্ষণ নেই

চাপে রয়েছে সরকার

বলার অপেক্ষা রাখে না, আন্তর্জাতিকভাবে বর্তমান সরকার বেশ চাপের মধ্যে রয়েছে। ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর গঠিত সরকার প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা ইউরোপীয় দেশগুলো কূটনৈতিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখলেও এ নির্বাচনকে স্বীকৃতি দেয়নি। এ দেশগুলোর পক্ষ থেকে বার বার সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের কথা বলা হচ্ছে। রাশিয়া, জাপান, চীন ও ভারতের মতো রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে সমর্থন আদায়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকার একটি সুবিধাজনক বাতাবরণ তৈরি করতে সক্ষম হলেও যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তির সঙ্গে তার দূরত্ব এখনো দৃশ্যমান। সম্প্রতি ঢাকার যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে, বাংলাদেশ যাতে রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা অবরোধ কার্যকর করে। ইউক্রেনের বিদ্রোহীদের অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করার ও পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে রুশ সৈন্য মোতায়েন করার অভিযোগ এনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে, যার প্রধান লক্ষ্য রাশিয়ার তেল ও গ্যাস খাত। যুক্তরাষ্ট্রের এ সতর্কতা অনুযায়ী, অবরোধের মধ্যে লেনদেন হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ ফ্রিজ করা হতে পারে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বাপেক্সের সঙ্গে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্যাজপ্রমের বিনিয়োগ চুক্তি রয়েছে। ফলে বাংলাদেশে রুশ বিনিয়োগের লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হতে চলেছে। বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা অবশ্য ধারণা করছেন, এ অবরোধ সাময়িক এবং এর ফলে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বরং বাংলাদেশ লাভবান হবে। কেননা রাশিয়া তার ভোগ্যপণ্য আমদানির জন্য এখন পশ্চিমের বদলে পুবের দিকে মনোযোগী হবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্য উৎপাদক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৃতই কতটা সুবিধা আদায় করতে পারবে, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সাম্প্রতিক সময়ে আগের চেয়ে গভীর হয়েছে। ক্রিমিয়া ইস্যুতে জাতিসংঘে ভোটাভুটির সময় বাংলাদেশ ভোটদানে বিরত থাকে। বাংলাদেশের এ অবস্থানকে যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। গাজায় ইসরায়েলিদের সর্বশেষ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতিবাদী অবস্থানকেও যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবে নেয়নি।

তবে মধ্যবর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা

আবারও নাকচ করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘের শান্তি সম্মেলনে যোগ দেয়ার পর নিউইয়র্কে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'কার জন্য মধ্যবর্তী নির্বাচন? অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতায় আনতেই মধ্যবর্তী নির্বাচন?' এ সময় তিনি বিএনপির সঙ্গে সংলাপের সম্ভাবনাও নাকচ করে দেন।

সুবিধা করতে পারছে না বিএনপি জোট

সরকারের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও নির্বাচন বর্জনকারী বিএনপি ও তার সমমনা দলগুলো রাজনৈতিকভাবে কোনো আবেদন রাখতে পারছে না জনগণের সামনে। ঈদের আগেই ভাঙনের সুর বেজে উঠেছে ২০ দলীয় ঐক্যজোটে। শেখ শওকত হোসেন নীলুর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল পিপলস পার্টি বা এনপিপি এ ভাঙনের সূচনা করে এবং এর সূত্র ধরে ২৫ সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশ করেছে নতুন রাজনৈতিক জোট ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ)। নতুন এ জোটে রয়েছে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি এনপিপি (শেখ শওকত হোসেন নীলু), ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এনডিপি, আলমগীর মজুমদার), বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (জোবাইদা কাদের-আতিক), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ, শেখ আনওয়ারুল হক), জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল, মালেক), লেবার পার্টি (সেকান্দার আলী), বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি (আবদুর রশিদ প্রধান), ইনসাফ পার্টি (শহীদ চৌধুরী), তৃণমূল ন্যাপ ভাসানী এবং ভাসানী ফ্রন্ট (মমতাজ চৌধুরী)।

তবে জোট ও দলকে চাঙ্গা করতে বিএনপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাস হওয়ার পর দীর্ঘদিনের নীরবতা ভেঙে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর প্রথমবারের মতো হরতাল আহ্বান করে। যদিও এ হরতাল তেমন কোনো আলোড়ন তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে হরতালের পর থেকেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সংগঠন গোছানো ও জনসংযোগের লক্ষ্যে জনসভা করতে শুরু করেছেন। এর মধ্যেই জনসভা হয়ে গেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও জামালপুরে। জোটের ভাঙন সম্পর্কে খালেদা জিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনসভায় বলেন, 'অনেকে বলেছে জোট ভেঙে যাচ্ছে। আমি বলছি, এই জোট ভাঙবে না। এই জোট শক্তিশালী আছে, শক্তিশালী থাকবে।'

২০ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে আসার পর নতুন জোট গঠনকারী নেতারা যেসব কথা বলছেন, তা থেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে জোটটিতে মতবিরোধ ছিল। কিন্তু বিশেষত জোটের প্রধান দল বিএনপির অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত ছোট দলগুলোকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। নতুন গঠিত এনডিএফ-এর চেয়ারম্যান শেখ শওকত হোসেন নীলু বলেছেন, বিএনপি-জামায়াত সব সিদ্ধান্ত তাদের ওপর চাপিয়ে দিত। নীলু এ-ও বলেছেন, খালেদা জিয়া ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে না যাওয়ার বিষয়ে ভুল স্বীকার করলে এবং তাকে বহিষ্কারের ব্যাপারে অনুশোচনা করলে তারা জোটে পুনরায় ফিরে যাওয়ার বিষয়টিকে বিবেচনা করবেন। এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে, যে কোনো সময় এ দলগুলো বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটে ফিরে যেতেও পারে।

জোটের সমস্যার চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার হলো, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে বিএনপি কিছুতেই পারছে না বেরিয়ে আসতে। দলের সিনিয়র নেতাদের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা তো আছেই, সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে কনিষ্ঠ নেতাদের ও কর্মীদের দূরত্ব মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। মাঝেমধ্যেই বিভিন্নভাবে সে দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। যার সাম্প্রতিক উদাহরণ দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমদের বই 'বাংলাদেশ : ইমারজেন্সি অ্যান্ড দি আফটারম্যাথ ২০০৭-০৮' প্রকাশের পর সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির আরেক নেতা রুহুল কবির রিজভীর প্রতিক্রিয়া। রিজভী তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষণে ক্ষণেই রঙ বদলান।' তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'তিনি কি নিজের বাড়ি রক্ষা করতে নাকি ক্ষমতাসীনদের সন্তুষ্ট করতে এসব করছেন?' প্রতিক্রিয়ায় মওদুদ আহমদ বলেন, 'বইটি পড়ে রিজভীর মন্তব্য করা উচিত ছিল।' এদিকে, সংসদ নির্বাচনের পর দীর্ঘদিনের নীরবতা ভেঙে বিচারপতিদের অভিশংসন-সংক্রান্ত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের দাবিতে বিএনপি ও তার সমমনা দলগুলো ২২ সেপ্টেম্বর হরতাল আহ্বান করে। কিন্তু সেদিনও বিএনপির নেতা-কর্মীদের মাঠে নামতে দেখা যায়নি। যা নিয়ে নানা সমালোচনা হচ্ছে এবং বিএনপির সাংগঠনিক দৃঢ়তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

এই সাংগঠনিক স্থবিরতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বিএনপির একটি অংশ চাইছে তারেক রহমানের স্ত্রী জোবায়দা রহমানকে রাজনীতিতে নিয়ে আসতে। পারিবারিকভাবেও এখন সে রকম সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। কেননা বয়সজনিত কারণে খালেদা জিয়ার পক্ষে সক্রিয়ভাবে যেমন বিএনপির হাল ধরা সম্ভব নয়, তেমনি রাজনৈতিক হয়রানির আশঙ্কায় তারেক রহমানেরও দ্রুত দেশে ফেরার কোনো সম্ভাবনা নেই। সবকিছু ঠিক থাকলে এ মাসেই দেশে ফিরবেন জোবায়দা রহমান এবং হাল ধরবেন বিএনপির।

কামাল-মান্নার বিকল্প চেষ্টা

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জোটের বাইরে একটি বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েক মাস ধরেই প্রচেষ্টা চলছে। ঈদুল ফিতরের আগে ১৮ জুলাই এক ইফতার পার্টিতে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছিলেন, 'বিএনপি রোজার পর আন্দোলন করবে। রোজার পর আমরাও মাঠে নামব। আমাদের অভিভাবক ড. কামাল আমাদের সঙ্গে থাকবেন। যারা বলেন ড. কামালকে দিয়ে কিছু হবে না, তারা দেখবেন ড. কামালকে দিয়ে কী হয়।...আমাদের আন্দোলন সফল হবে। কারণ, জনগণ জানে, মাহমুদুর রহমান মান্না যখন কথা বলে, ড. কামাল হোসেন যখন কথা বলে, শাহদীন মালিক যখন কথা বলে, ড. আসিফ নজরুল যখন কথা বলে তখন তারা কোনো ধাপ্পাবাজি থেকে কথা বলে না।' এরই ধারাবাহিকতায় ঈদুল ফিতরের পর বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের পর ৪ সেপ্টেম্বর ড. কামালের মতিঝিল চেম্বারে একটি রাজনৈতিক জোট গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হয়। যাতে অংশ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব, নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না, আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সুলতান মোহাম্মদ মনসুর প্রমুখ। এ বৈঠকে তারা ১১ দফার ভিত্তিতে সারাদেশে যুগপৎ ও যৌথভাবে মতবিনিময় সভা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নির্ধারিত ১৪ সেপ্টেম্বর সিপিবি-বাসদ ছাড়া অন্য কোনো সংগঠনকেই কর্মসূচি পালন করতে দেখা যায়নি। ফলে শুরুতেই হোঁচট খেয়েছে তৃতীয় বিকল্প রাজনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগ। তা ছাড়া জেএসডিকে ঐক্যপ্রক্রিয়ায় রাখার ক্ষেত্রেও আপত্তি রয়েছে সিপিবির। এ রকম প্রেক্ষিতে এদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ায় ভাটা পড়েছে। তবে গণফোরাম এবং নাগরিক ঐক্য যুক্তভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করে চলেছে। যার ধারাবাহিকতায় ১৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে এ দুটি সংগঠন যৌথভাবে একটি জনসভাও করেছে।

কিন্তু বলাই বাহুল্য, এই বিকল্প উদ্যোগ এখন পর্যন্ত তেমন কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। সব মিলিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে চলছে স্থবিরতা এবং তা দূর হওয়ার আশু কোনো লক্ষণ নেই। ■